দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

147

গত এক যুগে দেশের শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগে

তিন ভাগের দুই ভাগ মেয়ে প্রাইমারি স্কুলে যায় না

সমুদ্র হক, বগুড়া অফিস থেকে

দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ মেয়ে কখনও প্রাইমারি স্কুলে যায় না। গত এক যুগে শিক্ষার হার মাত্র ৩ দশমিক ৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগে। (এ হার সাক্ষরতার হার ধরে)। এক হিসাবে দেখা যায়, পুরুষদের সাক্ষরতার হার যেখানে ৩২ শতাংশ সেখানে মেয়েদের এ হার ১৬ শতাংশ অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় অর্ধেক।

সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হলেও সিংহভাগ মেয়ে শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করান যায়নি। দুর্বল স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, পেরেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশন, সুষ্ঠুভাবে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী না থাকা, স্কুলের দূরত্ব, স্কুলে মেয়েদের টয়লেট সুবিধা না থাকায় স্বল্পসংখ্যক মেয়ে শিশুকে স্কুলে আনা গেলেও বেশিরভাগই ঝরে পড়েছে (ড্রপ আউট)। আবার গ্রামের বাবা-মা এরা যার দু'টি সন্তান একজন ছেলে ও একজন মেয়ে আছে তারাও ছেলে শিশুকেই স্কুলে পাঠান। মেয়ে শিশুদের পড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও পাঠান হয় মক্তব অথবা মাদ্রাসায়। যেখানে পরিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রামের মেয়েরা এখনও আছে আড়ালে।

দশ থেকে ১৪ বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ স্কুলে হাজিরা দেয়। ছেলেদের বেলায় এ হার ২৩ ভাগ। যেখানে ৪ জন বালকের মধ্যে একজন অর্থাৎ ২৫% উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় সেখানে বালিকাদের মধ্যে মাত্র দশজনে একজন অর্থাৎ ১০% এ সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার উপযুক্ত মাত্র শতকরা ২ ভাগ সুযোগ পায়।

দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক কম। সাক্ষরতার হারেও পুরুষ-মহিলা, গ্রাম ও শহরে পার্থক্য আছে। ৫ বছরের অধিক বয়সের গ্রামীণ সাক্ষরতার হার ২৫ দশমিক ১ ভাগ। এ ক্ষেত্রে পুরুষের হার ৩২ ভাগ, মেয়েদের ১৭ দশমিক ৫ ভাগ। শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৬২ দশমিক ৩ ভাগ। এ ক্ষেত্রে পুরুষের হার ৭২ দশমিক ৭, মহিলার হার ৫২ দশমিক ৫ ভাগ।

মেয়েদের স্কুলে না আসার পিছনে কারণগুলো অনুসন্ধানে দেখা যায়, গ্রামের বেশিরভাগ অভিভাবকই সরকারী পরিকল্পনার কথা জানেন না। এমনকি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ খবরও ঠিকমতো পৌঁছান হয়নি। আবার অভিভাবকদের এমনও বলতে শোনা যায় 'মেয়ে যখন বিয়ে দিলেই পরের বাড়ি চলে যাবে কি হবে লেখাপড়া শিখিয়ে বরং মক্তবে গিয়ে আলিফ বে শিখুক'। এই মানসিকতা এখনও কাটান যায়নি। বোঝান হয়নি পুরুষ শিক্ষিত হলে একজন শিক্ষিত, আর মেয়ে শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়। শহর ও গ্রাম এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুল কমিটিতে মেয়েদের সম্পৃক্ত করা হয়নি। থানা পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য পুরুষ কর্মীর সংখ্যাই বেশি। মহিলা কর্মীর সংখ্যা খুব কম। ফলে দেখা দেয় বৈষম্য।

দেশে প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সেটেলাইট বা ফিডার স্কুল চালুর পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়ন হয়নি। স্কুলে মেয়েদের টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়নি। শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনায় আছে গ্রামের কেউ যদি ৩৩ শতাংশ জায়গা দেয় তাহলে সরকার ৪ জন শিক্ষক, ১টি ঘর ও দুই লাখ টাকা দেবে— এ তথ্যও গ্রামের অনেকেই জানে না। মোট কথা দেশে মেয়ে শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিত করার ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মেয়েরা শৈশবে পিতার অধীনে একজন কন্যা, যৌবনে স্বামীর অধীনে একজন বধূ ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে একজন শাশুড়ি ও ঘরে রান্না— এই জীবনচক্রেই বাঁধা রয়েছে।